ভৌতিক উপন্যাস

রক্ততৃষ্ণা

ভৌতিক উপন্যাস

রক্ততৃষ্ণা

মোশতাক আহমেদ

অনিন্দ্য প্রকাশ

অনিন্দ্য প্রকাশের প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৪২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : মানবেন্দ্র সুর

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

Roktotrishna by **Mostaque Ahamed**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : September 2020

Price : 300.00
US $ 10

ISBN 978 984 94894 2 9

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
www.booklightbd.com ফোনে অর্ডার করতে ০১৪০০৪০০৪০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

প্রিয় বন্ধু রাজাকে
যার মনটা সত্যি রাজার মতো

করিম মওলা বড়ো বড়ো চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে। তার জীবনে যে ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারছে সে। তবে এই ভয়ংকর কিছু তার মৃত্যু কি না এ বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়। কিন্তু কেন যেন তার মনে হচ্ছে আজ তার মৃত্যুই ঘটবে এবং মৃত্যুটা হবে খুব যন্ত্রণাময় এবং বীভৎস। নিজের সেই যন্ত্রণাময় এবং বীভৎস মৃত্যুটা দেখতে চাচ্ছে না বলেই হয়তো সে চোখ বন্ধ করতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সে বুঝতে পারল চোখের ওপর তার নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। শুধু চোখই নয়, শরীরের কোনো অংশের ওপরই তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তার সবকিছু যেন নিয়ন্ত্রণ করছে অন্য কেউ। আর এই অন্য কেউ যে তার দিকে এগিয়ে আসা অপূর্ব সুন্দর ঐ মেয়েটি, এ ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ নেই।

করিম মওলা শেষবারের মতো শরীরের সমস্ড় শক্তি এক করতে চেষ্টা করল। সে এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উঠে দাঁড়াবেই। যেভাবেই হোক পালাবে স্যাঁতসেঁতে এই অতি পুরাতন ঘর থেকে। ঘরটা যেন কেমন! অশরীরী অশরীরী মনে হয় তার কাছে। দেওয়ালগুলো এবড়োখেবড়ো, কত বছর যে এখানে চুনের ছোঁয়া পড়ে না তা কেউ বলতে পারবে না। ঘরটার এখানে-ওখানে বড়ো বড়ো শিকল ঝুলে আছে। কতকগুলো শিকল দেওয়ালের সাথে আটকানো। অন্যপাশে আংটা লাগানো। দেখে মনে হবে বুঝি এটা কোনো বন্দিখানা, বন্দিদের ধরে এনে শিকল দিয়ে বেঁধে এখানে তাদের ওপর অত্যাচার করা হয়। আর সবচেয়ে ভয়ংকর ঘরের মধ্যকার কফিনটা। কফিনটাই মূল আতঙ্কের উৎস। কারণ ঐ কফিনের মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছে মেয়েটি।

অর্ধশিক্ষিত করিম মওলা স্বভাবে নরম মানুষ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ

কালাম পড়ে। টুকটাক রড-সিমেন্ট আর ঠিকাদারি ব্যবসা করে জীবন কাটায়। কারো সাথে তার কোনো শত্রুতা কিংবা মনোমালিন্য নেই। তার মতো মানুষ কীভাবে এই ভয়ংকর জায়গায় এসে পড়ল তা সে বুঝতে পারল না। আর এখন এসব কী ঘটছে তারও কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না সে। সে সব সময়ই জানত কফিনের মধ্যে মৃত মানুষ থাকে। আর সেই কফিন থেকে জীবিত মানুষ বের হয়ে আসার রহস্য কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছে না। ব্যাপারটা ভৌতিক কিংবা অশরীরী কি না তাও বুঝতে পারছে না। অবশ্য তার না-বোঝারই কথা। ধর্মপ্রাণ করিম মওলা শুধু আল-াহকেই বুঝতে চায়, অন্য কাউকে নয়।

করিম মওলা উঠে দাঁড়ানোর জন্য যখন পা টান দিলো তখন তার বড়ো চোখদুটো আরো বড়ো হয়ে গেল। সে দেখতে পেল তার ডান পা-টা গোড়ালির কাছে শিকল দিয়ে আটকানো। উঠে দাঁড়াতে পারলেও সে ছুটে পালাতে পারবে না। ভয় আর উত্তেজনার মধ্যেও শিকল ধরে কয়েকবার টানাটানি করল সে। অবশেষে বুঝতে পারল সবই বৃথা। নিজেকে একেবারে অসহায় মনে হলো তার। একইসাথে কেমন যেন শীত শীতও করতে লাগল। স্যাঁতসেঁতে জায়গায় শীত কিছুটা লাগারই কথা। কিন্তু এতটা যে নয় তা সে বুঝতে পারছে। শীত লাগার কারণ খুঁজতে নিজের শরীরের দিকে তাকাল সে। আর তাতেই চমকে উঠল। তার শরীরে পাজামা ছাড়া অন্য কোনো কাপড় নেই। বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল করিম মওলা। শরীরে কাপড় না রেখে সে কখনোই থাকে না। এমনকি স্ত্রীর সামনেও সে খালি গা হয় না। আর সে কি না এখন এই নির্জন পরিবেশে অল্পবয়সি আর সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মেয়ের সামনে প্রায় নগ্ন হয়ে আছে, ভাবতেই মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল তার।

করিম মওলার হঠাৎই মনে হলো সে বুঝি দোজখে আছে। কিন্তু কী পাপে সে দোজখবাসী হয়েছে তা সে বুঝতে পারল না। জীবনে জেনেশুনে যে কোনো পাপ করেছে তাও মনে করতে পারল না। রড-সিমেন্ট আর ঠিকাদারির ব্যবসা করলেও কোনোদিন কারো সাথে প্রতারণা করেনি, কাউকে ঘুস দেয়নি কিংবা ঠকায়নি। এমনকি জীবনে

সুদ পর্যন্ড় খায়নি। তাহলে কেন তার এই পরিণতি! ভাবতেই বুক চিরে তার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

মেয়েটির দিকে চোখ পড়তে করিম মওলা নিশ্চিত হলো সে দোজখে নেই। কারণ দোজখে আর যাই থাকুক, এত সুন্দর চেহারার মেয়ে থাকবে না। সে নিজে সারাটা জীবন স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকায়নি। কোনো নারীর সৌন্দর্য তাকে এতটুকু আকৃষ্ট বা মোহিত করতে পারেনি। অথচ সামনের এই মেয়েটি এত সুন্দর যে সে না তাকিয়েও পারছে না। কী নেই মেয়েটির সৌন্দর্যে? কোমর পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত লম্বা কালো চুল, চিকন ভুর, টিকোলো নাক, টানাটানা চোখ, লাল টকটকে পাতলা দুটো ঠোঁট, ফরসা মসৃণ ত্বক—সবই নিখুঁত, একেবারেই নিখুঁত। বয়সও খুব বেশি হবে না, আঠারো কি উনিশ। আর শারীরিক গঠন, নিশ্চিত যে-কোনো পুরষকে আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। করিম মওলার বারবার মনে হতে লাগল মেয়েটির এই অপূর্ব সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে কোনো ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা কিংবা চরম পৈশাচিকতা। এই বিশ্বাস তাকে প্রথম থেকেই ভীতু করে রেখেছে। তার মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ মেয়েটির শাড়ি পরার ধরন। সে মোটেও শালীনভাবে শাড়ি পরেনি। শাড়িটার রং লাল হলেও এতটাই পাতলা যে শরীরকে পর্যাপ্তভাবে আবৃত করতে পারছে না। শাড়িসংশি- ষ্ট আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাপড়েও যেন স্বল্পতা রয়েছে। শাড়ির আঁচলটিও সঠিক স্থানে নেই। আঁচলটির স্থানচ্যুতিতে যেন মেয়েটির নিজেরই সক্রিয় ভূমিকা আছে। সর্বোপরি মেয়েটির শাড়ি পরার ধরনে মনে হবে এটা যেন তার নিজেকে আরো বেশি আবেদনময়ী করে তোলার প্রচেষ্টা। আর এ কারণেই মেয়েটির প্রতি ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে করিম মওলার। কারণ সে জানে, সুন্দরী মেয়ে যখন নিজেকে অন্যের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলার প্রচেষ্টায় নিজের শালীনতাকে বিসর্জন দেয় তখন সেই মেয়ের উদ্দেশ্য ভালো থাকে না। এজন্যই সে এতটা আতঙ্কিত, এতটা ভীত।

করিম মওলার ভয় আরো বাড়ল যখন সে মেয়েটির গলায় সিলভার রঙের ধাতব একটা ত্রিশূল দেখতে পেল। ত্রিশূলটা চার ইঞ্চির মতো লম্বা এবং লাল মোটা একটা সুতায় গলা থেকে বুকের

ওপর ঝোলানো। ত্রিশূলের তিনটা দই সমান লম্বা এবং অগ্রভাগ খুবই সুচালো। কোনো সুস্থ মস্ড়িষ্কের মানুষ এমন সুচালো অগ্রভাগবিশিষ্ট ত্রিশূল গলায় ঝোলাবে না। যে-কোনো সময় এটা নিজের শরীরেই ঢুকে যেতে পারে। অথচ মেয়েটি ঠিকই ত্রিশূলটা তার গলায় ঝুলিয়েছে। মেয়েটির এরকম আচরণের কী কারণ থাকতে পারে তা খুঁজে পেল না সে।

করিম মওলা মনে মনে দুবার তওবা করল। সে জীবনে যা করেনি এখন তাই করছে। সামনের মেয়েটির দিকে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছে এবং তাকে নিয়ে ভাবছে। এটা সম্পূর্ণই তার স্বভাববিরদ্ধ। করিম মওলা সিদ্ধান্ড় নিল সে আর মেয়েটির দিকে তাকাবে না। এই সিদ্ধান্ড় থেকেই সে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। ঘুরেফিরে তার দৃষ্টি আবার মেয়েটির ওপর গিয়ে পড়ল। সে লক্ষ করল মেয়েটি তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিটা কেমন যেন রহস্যময়। দৃষ্টির মধ্যে কীসের যেন কামনা, কীসের যেন তৃষ্ণা!

মেয়েটি যখন করিম মওলার সামনে এসে বসল তখন মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল করিম মওলার। তার মনে হলে সে যেন কোনো ঘোরের মধ্যে আছে। সবকিছু কেমন যেন ঘোলা ঘোলা মনে হচ্ছে তার কাছে। নিজেকে ঠিক করতে জোরে মাথা ঝাঁকি দিলো সে। তারপর সরে আসতে চেষ্টা করল পেছনের দিকে। কিন্তু পারল না, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেল। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে চোরাচোখে তাকাল মেয়েটির দিকে। দেখল, আগের মতোই মেয়েটি তাকিয়ে আছে তার দিকে। তবে চোখের মণিদুটো এখন আগের তুলনায় অনেকটা অস্থির।

মেয়েটি আরো কাছে আসতে করিম মওলা হঠাৎই সাহস করে বলে ফেলল, আ...আ...আপনে কে? আপনের পরিচয় কী?

মেয়েটি কোনো উত্তর দিলো না। শুধু ডানদিকে মাথা বাঁকিয়ে আরো গভীরভাবে তাকাল করিম মওলার দিকে।

করিম মওলা আবার বলল, আ...আ...আপনে কথা বলেন না ক্যান? আপনের পরিচয় কী?

মেয়েটি এবার বাঁকা একটা হাসি দিলো। তারপর ফ্যাসফেসে গলায় বলল, তৃ...ষা।

তৃষার গলার স্বরটা ভালো লাগল না করিম মওলার। কিন্তু সাহস হারাল না সে। বলল, আ...আ...মি এইখানে ক্যান?

আ...মা...র জ...ন্য। টেনে টেনে উত্তর দিলো তৃষা।

উত্তর শুনে একেবারে জমে গেল করিম মওলা। তৃষা নামের এই অদ্ভুত মেয়েটির উদ্দেশ্য কী সে তা বুঝতে পারছে না। তার মতো একজন পেটমোটা মধ্যবয়সিকে এই তৃষার কী প্রয়োজন হতে পারে তা তার মাথায় ঢুকল না। সে তোতলাতে তোতলাতে আবার বলল, আ...আ...আমারে এইখানে আনছেন ক্যান?

তৃষা ঘাড় কাত করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে করিম মওলার দিকে তাকাল। তারপর আগের মতোই রহস্যময় কণ্ঠে টেনে টেনে বলল, আমার তৃষ্ণা মেটানোর জন্য।

উত্তর শোনার সাথে সাথে বুকটা ধক করে উঠল করিম মওলার। তৃষা যে এরকম একটা কথা বলবে তা সে কল্পনাতেও ভাবতে পারেনি। এখন তার সত্যি খুব ভয় করছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কয়েকবার ঢোক গিলতে চেষ্টা করেও পারল না সে। পরিবেশ-পরিস্থিতি এতটাই প্রতিকূল যে তার মনে হচ্ছে ভয়ে দমটা বুঝি এই এক্ষুনি বের হয়ে যাবে।

তৃষা এবার করিম মওলার আরো কাছে এলো। তৃষার ঘনিষ্ঠতায় ভারি হয়ে উঠল করিম মওলার মাথাটা। চোখেও ঝাপসা দেখতে শুর" করেছে সে। সে বুঝতে পারছে তার আর কিছু করার নেই। তৃষা তাকে সম্পূর্ণই নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তাকে এখন তৃষার ইচ্ছে অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।

করিম মওলা চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করতে তৃষা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, তোকে না বলেছিলাম এই বাড়ির ধারেকাছেও আসবি না। তুই ক্যান এসেছিস?

আ...আ...আমি বুঝবার পারি নাই। বুঝলে জীবনেও আসতাম না। বলতে চেষ্টা করল করিম মওলা। কিন্তু সে বলতে পারল না। তার মুখ দিয়ে শুধু অ...ব...ব... শব্দ বের হলো।

আমি তোকে অনেকবার বোঝাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তুই বুঝিসনি। তোকে আর বুঝতে হবে না। তোর বোঝার সময় শেষ হয়ে গেছে। আগে আমি অনেককেই বোঝাতে পেরেছি, শুধু তোকে বোঝাতে পারলাম না। এখন তুই তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবি।

এই বলে তৃষা জোরে খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসিটা করিম মওলার মোটেও ভালো লাগল না। এই হাসির অর্থ যে শুভ কিছু নয়, তা বুঝতে তার অসুবিধা হলো না। সে আরো বিমর্ষ হয়ে পড়ল যখন দেখল তৃষার হাতের আঙুলগুলো তার চোখের সামনে কিলবিল করছে। প্রত্যেকটি আঙুলেই বড়ো বড়ো নখ, যেন অনেকদিন কাটা হয় না নখগুলো। নখগুলোও ত্রিশূলের দ"ের মতো সুচালো।

তৃষার আঙুলগুলো যখন করিম মওলার কপাল স্পর্শ করল তখন সে থরথর করে কেঁপে উঠল। আঙুলগুলো আরো খানিকটা নিচে নামতে করিম মওলার মনে হলো তৃষা বুঝি তার সুচালো নখ দিয়ে তার চোখদুটো তুলে নেবে। কিন্তু তার কপাল ভালো তেমন কিছু ঘটল না। আঙুলগুলো ধীরে ধীরে আরো নিচে নামতে লাগল। তারপর বুকের ওপর এসে একেবারে স্থির হয়ে গেল। ভয়ে একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেল করিম মওলা। সে নিশ্চিত তৃষা এবার তার ধারালো নখগুলো তার বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে বের করে আনবে হৃৎপি"টা। তারপর তাজা টাটকা হৃৎপি" তার চোখের সামনেই চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। এরকম ভাবতেই তার হৃৎস্পন্দন কয়েকগুণ বেড়ে গেল, খাড়া হয়ে গেল শরীরের সমস্ড় লোমগুলো।

তৃষা হঠাৎই বাম হাতে করিম মওলার ডান হাতের কবজি আঁকড়ে ধরল। তৃষার এ ধরনের আচরণে চমকে উঠল করিম মওলা। তৃষার উদ্দেশ্যটা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। তৃষা তার হাতের দিকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে। একটু ভালোমতো লক্ষ করতেই করিম মওলা বুঝতে পারল সে তার হাতের রক্তনালিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। তৃষা যখন ডান হাত দিয়ে তার হাতের রক্তনালিগুলোর ওপর আলতোভাবে হাত বোলাল তখন ভয়ের একটা শীতল স্রোত তার মের"দ" বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেল।

করিম মওলা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তৃষা তার গলায় ঝুলে থাকা

ত্রিশূলটা তার হাতের রক্তনালির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। ব্যথায় শুধু একবার উহ্ শব্দ করতে পারল সে। তারপর একেবারে চুপসে গেল। তৃষার লাল চোখের সামনে টুঁ শব্দ করার সাহসও তার হলো না।

করিম মওলা স্পষ্ট দেখতে পেল তৃষা ত্রিশূলের অপরপ্রান্তে মুখ লাগিয়ে টান দিতে তাজা রক্ত ত্রিশূলের মধ্য দিয়ে তৃষার মুখে গিয়ে পৌঁছাল। তৃষা খুব তৃপ্তির সাথে সেই রক্ত পান করতে শুরু করল। চোখের সামনে কাউকে নিজের রক্ত পান করতে দেখে আর সহ্য করতে পারল না করিম মওলা। শরীরের সমস্ত শক্তিতে 'বাঁচাও বাঁচাও, আমারে বাঁচাও' বলে চিৎকার করে উঠল।

করিম মওলার স্ত্রী রাবেয়া ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, কী ব্যাপার? কী হইছে তোমার? চিৎকার করছে ক্যান?

করিম মওলার কানে কিছুই ঢুকল না। সে আগের মতোই চিৎকার করে বলতে থাকল, আমারে মারবেন না, আমারে মারবেন না। আমি বাঁচবার চাই, বাঁচবার চাই।

রাবেয়া এবার করিম মওলার শরীরে জোরে ধাক্কা দিয়ে বলল, অ্যাই, তোমার কী হইছে? ওঠো ওঠো। তোমারে কে মারবার আইছে?

চোখ খুলে করিম মওলা কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে স্ত্রী রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল।

এরই মধ্যে বাতি জ্বালিয়েছে রাবেয়া। সে করিম মওলার ওপর ঝুঁকে এসে বলল, আইজ রাইতেও তুমি খারাপ স্বপ্ন দ্যাখছ?

অস্পষ্ট উচ্চারণে করিম মওলা বলল, কয়টা বাজে?

মাথার পাশের টেবিলে ঘড়ি দেখে রাবেয়া বলল, রাইত তিনটা।

করিম মওলা উঠে বসল এবার। তারপর সন্দেহ নিয়ে তাকাল চারদিকে। না কেউ নেই, কোথাও নেই। হঠাৎ মনে পড়েছে এমনভাবে সে ডান হাতের কবজির দিকে তাকাল। ডান হাতে কিছু না দেখে বাম হাতটাও ভালোমতো পরীক্ষা করল সে। এবারও কিছু না দেখে লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল, রাবেয়া, স্বপ্নটা খুব খারাপ দেখলাম।

তুমি যে খারাপ স্বপ্ন দ্যাখছ তা আমি বুঝছি। ঘামে একেবারে ভিজা গ্যাছো।

রাবেয়া, আমার কী মনে হয় জানো। আমি যা দেখছি তা স্বপ্ন না,

সত্য ঘটনা।

তুমি কি আবার সেই একই স্বপ্ন দ্যাখছ?

হুঁ। তয় আইজকেরটা ছিল আরো ভয়ানক। আ...আ...আমার রক্ত খাইতেছিল।

রাবেয়া চোখ কুঁচকে বলল, কী যা-তা বলছ? কে তোমার রক্ত খাবে?

করিম মওলা রাবেয়ার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, আমি আইজ আর ঘুমাব না। আমারে ওজুর পানি দাও। বাকি রাইতটা জায়নামাজে কাটায় দেবো।

স্বামীর আচরণটা স্বাভাবিক মনে হলো না রাবেয়ার কাছে। তার স্বামী যে বড়ো ধরনের কোনো বিপদে আছে সেটা বুঝতে পারল সে। গত তিন রাতেই তার স্বামীকে সে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠতে দেখেছে। ঘুম থেকে উঠে প্রত্যেকবারই বলেছে— স্বপ্নটা ছিল ভয়ানক। আর আজ তো বলেই বসল কে যেন তার রক্ত খাচ্ছিল। রাবেয়া বুঝল এমন স্বপ্ন কখনোই শুভ হতে পারে না। তাই সে সিদ্ধান্ত নিল, স্বামীর মঙ্গলের জন্য বাকি রাতটুকু সেও নামাজ পড়ে কাটিয়ে দেবে।

ভোর সাতটার সময় করিম মওলা জমিদারবাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হলো। তখনো শ্রমিকরা কেউ আসেনি। অবশ্য এত সকালে তাদের আসার কথাও নয়। কাজ শুর" হবে সকাল আটটায়। তাই সবাই আটটার কিছু আগে এসে পৌঁছাবে। করিম মওলা অবশ্য তার সিদ্ধান্ড় নিয়ে ফেলেছে। সে আর এ বাড়িতে কাজ করাবে না। এজন্যই সকাল সকাল জেলাশহর থেকে ছুটে এসেছে যেন মিস্ত্রিরা কাজ শুর" করার আগেই সে কাজ বন্ধ করতে পারে। জেলাশহর থেকে এই বাড়ির দূরত্ব প্রায় চলি- শ কিলোমিটার। তারপরও সে এত সকালে এসেছে। সে নিশ্চিত হতে চায় তার অধীন কোনো শ্রমিক যেন এ বাড়ির একটু ধুলোও আর না সরায়। এর আগে সে একবার শুধু এই বাড়িতে এসেছিল। তাও কাজ নেওয়ার আগে। আসলে বাড়িটা কী অবস্থায় ছিল তা দেখার জন্য। তারপর আর আসেনি। করিম মওলা জানে আজই তার এই বাড়িতে শেষ আসা। এ জীবনে আর কোনোদিনও এ বাড়ির ধারেকাছে ঘেঁষবে না সে।

জমিদারবাড়িটা উপশহরের একেবারে শেষপ্রান্ড়ে। হাইওয়ে থেকে উপশহরের যে প্রধান রাস্ড়টা বেরিয়েছে সেটা এই জমিদারবাড়িতে এসে শেষ হয়েছে। ফলে হাইওয়ে থেকে তাকালে যে-কেউ দেখতে পাবে বাড়িটাকে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো সচরাচর এ বাড়ির ধারেকাছে কেউ ঘেঁষে না। কী এক অজানা কারণে এই বাড়ির প্রতি সবার ভয়। সবার কাছে এই বাড়িটা একটা ভৌতিক বাড়ি বলেই পরিচিত। সবাই বলাবলি করে এ বাড়িতে নাকি মৃত জমিদারদের আত্মা ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য এ ব্যাপারে কেউ কখনো কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি। আত্মাগুলোকে নিজের চোখে দেখেছে এমন কাউকেও পাওয়া যায়নি। তারপরও সবার ভয়। আর এ কারণেই রাতের বেলা তো দূরে

থাক, দিনের বেলায়ও এ বাড়ির আশপাশ দিয়ে কেউ হাঁটাচলা করতে চায় না।

দোতলা জমিদারবাড়িটা যে কে কবে তৈরি করেছিল তা কেউ বলতে পারে না। তবে লাল ইটের ভগ্নপ্রায় বাড়িটা যে এক সময় খুব জাঁকজমক আর জৌলুসপূর্ণ ছিল বাড়িটার বাহ্যিক গঠনে তা এখনো স্পষ্ট বোঝা যায়। করিম মওলা শুনেছে জমিদার বাবর ছিল এই বাড়ির শেষ বাসিন্দা। তাও এখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। কোনো এক রাতে জমিদার বাবর আর তার মেয়ে এই বাড়িতে একইসাথে আত্মহত্যা করে। আবার কেউ কেউ বলে দুজনই নিখোঁজ হয়ে যায়। তারপর থেকে এ বাড়িতে আর কেউ ছিল না। দীর্ঘদিন কারো মালিকানায় না-থাকায় বছর দশেক আগে সরকার বাড়িটাকে অধিগ্রহণ করে। তারপর থেকে সরকার পাঁচবার এই বাড়ি সংস্কার করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ড় আর পারেনি। কাজ শুর" করার দু-একদিনের মধ্যেই ঠিকাদাররা কিংবা শ্রমিকেরা কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করেছে। করিম মওলা বুঝতে পারছে ক্যান ঠিকাদাররা কাজ করতে চায়নি। গত তিনদিন সে যে স্বপ্ন দেখেছে এরকম স্বপ্ন দেখলে কেউই এই বাড়িতে কাজ করবে না।

করিম মওলা ধীরপায়ে লোহার তৈরি মূল গেটটার দিকে এগিয়ে গেল। ভেতরে পা বাড়াতে গিয়েও বাড়াল না সে। হঠাৎই তার মনে হলো তার পেছনে বুঝি কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা বুঝতেই শরীর শিরশির করে উঠল তার। কিন্তু পরক্ষণেই সালাম শুনে সে পেছনে ফিরে তাকাল।

করিম মওলা দেখল তার পেছনে গলা থেকে পা পর্যন্ড় বিশাল একটা ঝুলপাঞ্জাবি পরা আর লম্বা দাড়ির বৃদ্ধ এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথায় পাগড়ি, হাতে তসবি। বৃদ্ধের চুল, দাড়ি এমনকি ভুর" পর্যন্ড় পেকে সাদা হয়ে আছে। চেহারাটা এমন যে দেখলেই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে।

করিম মওলার জিজ্ঞাসু চোখ দেখে বৃদ্ধ নিজেই বললেন, আমি পাশের মসজিদের ইমাম।

করিম মওলা সাথে সাথে সালামের উত্তর দিয়ে বলল, আপনে

ভালো আছেন?

আলহামদুলিল□াহ। এত সকালে আপনি এখানে কী করছেন বাবা? আপনি কি বাড়ির ভেতরে যাবেন?

না না। থতমত খেয়ে বলল করিম মওলা। আমি আসলে...

আপনাকে আমি আগে একবার দেখেছি। আপনি মনে হয় এই বাড়ির কাজ শুর" করছেন।

জি ইমাম সাহেব, জি। আপনে ঠিকই ধরেছেন।

ইমাম সাহেব এবার বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার কাজ কতদূর হলো?

করিম মওলা কিছুটা ইতস্ড়ত করে বলতে চেষ্টা করল, আ...আ...আসলে আ...আ...আমি...

কাজ ছেড়ে দেবেন, এই তো?

করিম মওলা হাঁ করে ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকল।

ইমাম সাহেব আবার বললেন, নিশ্চয় খারাপ স্বপ্ন দেখেছেন?

জি জি, আগ্রহ নিয়ে বলল করিম মওলা।

ইমাম সাহেব কিছু বললেন না দেখে করিম মওলা এবার নিজেই বলল, আ...আ...আমি ঠিক সাহস পাইতেছি না।

সাহস না পেলে না করবেন। তবে মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। মানুষ সবই পারে। শুধু পারে না মহান আল-াহতালার সাথে। তিনি মহান, তিনি পরাক্রমশালী।

এ কথা বলে ইমাম সাহেব তসবি গুনতে গুনতে মসজিদের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইমাম সাহেবের কথাগুলো কেমন যেন রহস্যময় মনে হলো করিম মওলার কাছে। ইমাম সাহেব তাকে কী বোঝাতে চেয়েছেন ঠিকমতো বুঝতে পারেনি সে। তবে ইমাম সাহেবের আচরণের একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, তিনি চমৎকার শুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন। সাধারণত ইমাম সাহেবরা এতটা শুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন না। ইমাম সাহেবের এই ব্যাপারটা কেন যেন ঠিক মানানসই মনে হলো না করিম মওলার কাছে। তবে সে মনে মনে ঠিক করল সুযোগ পেলে ইমাম সাহেবের কাছে একবার আসবে। ধর্ম বিষয়ে নানা কথাবার্তা বলবে। তবে ভুলেও এই বাড়ির প্রসঙ্গ আনবে না। আজই এই বাড়ির

সাথে তার সকল সম্পর্ক শেষ হবে।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর হেডমিস্ত্রি রহমতকে আসতে দেখল করিম মওলা। এখানে সকল কাজের তদারকি সেই করে। হেডমিস্ত্রি রহমত কাছে আসতে করিম মওলাই আগে কথা বলল, কেমন আছো রহমত?

ভালো নাই ভাইজান।

ক্যান, কী হইছে?

এই বাড়িতে আর কাম করা যাব না।

ক্যান?

কেউই কাম করবার চায় না। সবাই ভয় পায়। এইভাবে তো কাম করা যায় না। কাইল সারাদিন কাম কইরা আগান যায় নাই। উলটা দুপুরের পর ইট পইড়্যা যহন একজনের মাথা ফাইট্যা গেল তহন পারলে সবাই কাম ছাইড়া চইলা যায়। আমি যতই বোঝাই কেউ বুঝবার চায় না। সবাইর একটাই কথা, কেউ আর এই বাড়িতে কাম করবে না।

একজনের মাথা ফাইট্যা গেছে! তুমি তো আমারে জানাইলা না।

এইডা আর এমন কী! কাম করতে গেলে এমন তো একটু-আধটু হবেই।